এই আমি আমি নারী

কৃষ্ণা রায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রাক্-কথন

'আমার মুখে অন্তহীন আত্ম-লাঞ্ছনার ক্ষত'।

'দেশহীন' : শঙ্খ ঘোষ

পাণ্ডুলিপি অবস্থায় বই-টির বিষয়বস্তু পাঠ করে, কোনো কোনো পাঠক প্রশ্ন করেছিলেন, 'এ কিসের বই? বিজ্ঞানের না সাহিত্যে'-র? নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলাম, এ বই মেয়েদের জন্য। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র নারী, তার দেহ-ঘিরে অফুরান জিজ্ঞাসা তথা কৌতূহল মেটানোর প্রয়াস মাত্র। নিজেকে যখন নারী বলে চেনা হয়ে ওঠেনি, তখনই দেহ-লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতায় যে নিজের শরীর-কে ঘেন্না করতে শেখে, কিংবা বয়ঃসন্ধি পর্বে শরীর-জোড়া পরিবর্তন দেখে স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করতে যে দ্বিধান্বিত হয়, সন্তান-হীনতার দায়ে অপরাধী বলে চিহ্নিত হয়ে যখন নিজের অদৃষ্টকে দোষারোপ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় তার জানা থাকে না, অথবা কন্যা-সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে শ্বশুরবাড়ির অমানবিক নির্যাতন যখন সে শিরোধার্য করে...সেই সব অজস্র 'সে' তথা মেয়ে-র জীবনে অন্তহীন আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত আমাকে প্রাণিত করেছে নারী-দেহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সত্যটি নিভৃত-ছায়ালোক থেকে সরব-সচেতনতায় তুলে ধরতে।

এ প্রসঙ্গে, খুব ছোটোবেলায় দেখা একটি দৃশ্য প্রায়-ই আমার স্মৃতিতে হানা দেয়। আল্‌তা-পরা লাল-টুকটুকে দুটি পা, বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা একটি শবদেহ, প্রচুর ফুল আর একঘেয়ে চাপা-কান্নার আবহে থই থই মানুষের ভিড়। আমি ভয় পেয়ে মায়ের হাত শক্ত করে ধরেছিলাম। আমার দমবন্ধ লাগছিল। বড়ো হয়ে সেই মৃত্যু-দৃশ্যের বিস্তৃত বিবরণ শুনেছিলাম। হাতুড়ে চিকিৎসকের সাহায্যে গর্ভ-নষ্ট করতে গিয়েছিলেন পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ-আত্মীয়া। পর পর চারটি কন্যা-সন্তান জন্ম দেওয়ার পর প্রভূত লজ্জায় সন্তান-সৃজন কর্ম থেকে তিনি অব্যাহতি চেয়েছিলেন। অথচ কন্যা-সন্তান জন্মের জন্য তার কোন দায় ছিল না, সন্তানের লিঙ্গ গঠনের জন্য আসল ভূমিকা তো পুরুষের। সে সময়, আমাদের দেশে গর্ভ-নিরোধের স্বীকৃত ব্যবস্থা তেমন ভাবে গড়ে ওঠেনি। তাই গর্ভ নষ্ট হল বটে, কিন্তু হতভাগ্য জননীটি ধনুষ্টঙ্কার (টিটেনাস)-এ আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীর মায়া কাটালেন। বহুকাল আগে দেখা তার অস্পষ্ট যুবতী মুখটি আজও আমায় বড়ো কষ্ট দেয়, কষ্ট হয় ভুল-সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া পরিচিত কিশোরীটির অনাতিথেয় মাতৃত্বের খবর জেনে। আমি চিকিৎসক, সমাজসেবী কিংবা নারীবাদী কোনোটি-ই নই। আজও, শারীরবিদ্যার (Physiology) সামান্য এক পড়ুয়া মাত্র। আমার চেনা-জগতে প্রায়শই লক্ষ

করি প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েরা নিজেদের শরীর চেনে না, কত যে ভ্রান্ত ধারণা মনে মনে পুষে রাখে। কী অনায়াস অজ্ঞতায় পারিবারিক সূত্রে, অর্জন করা অজস্র সংস্কারকে সযত্নে লালন করে নিজের অন্তর্লোকে, আর অকারণ হীনমন্যতায় নিজের ভাগ্যকে দোষ দেয়। সেদিন, বাসে যেতে যেতে একটি পরিচিতা স্কুল-শিক্ষয়িত্রী মহিলার অদ্ভুত স্বীকারোক্তি শুনলাম। আজকাল স্কুলে স্কুলে ছেলেমেয়েদের জীবনশৈলীর পাঠ দেওয়া হয়, নর নারীর যৌন-জীবন সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠদানের ব্যবস্থা। এ বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নাকি যথাযোগ্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মহিলাটি নাটকীয় ভাবে বললেন, বাব্‌বা! ক্লাসে মেয়েদের সামনে ওসব কথা বলব কী করে? ও তো বেড্‌-রুম সিক্রেট। চকিতেই, শৈশবে দেখা মৃত্যু-দৃশ্যটি মনে পড়ে যায়। চার দশক আগেকার, স্বল্পশিক্ষিত, উপার্জনহীন নারীটির সঙ্গে পাশে বসা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারিণী, উপার্জনক্ষম আধুনিকাটির সত্যি কি খুব পার্থক্য আছে? অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক চেতনা সব-সময় আনে কি? শরীর-ঘিরে অকারণ এক জড়তা তথা গোপনীয়তা আজও কত মেয়েকে যে আচ্ছন্ন করে রাখে! কী তার কারণ? যে দেশে নারীকে দেবী বলে আরাধনা করা হয়, আর পণের জন্য গৃহবধূকে পুড়ে মরতে হয় শ্বশুর বাড়িতে, অসহায় কন্যাভ্রূণটিকে জঠরেই মরে যেতে হয়, সেখানে নারীদেহের জীবতাত্ত্বিক প্রাথমিক ধারণাটি প্রতিটি মেয়ের কাছে পৌঁছয় না কেন—এ প্রশ্নে বহুদিন ধরে আমূল-আলোড়িত হয়েছি।

আমাদের দেশে, প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার সূচনা ১৮৩৯ সালে, বেথুন সাহেবের স্কুল-প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। সেদিনের পর, সার্ধ-শত বছর এবং আরও দুই দশককাল কাটতে চলল, অথচ নারীর জীবনে স্বাস্থ্য-সাক্ষরতার জন্য লক্ষ্যণীয় উদ্যোগ তেমন চোখে পড়ল কই? প্রথাগত শিক্ষায়, দেহভিত্তিক সচেতনতার দীক্ষা দেওয়া হয় না। আমরা মেয়েদের রূপচর্চা, রান্না, গান-বাজনা, সেলাই, জন-সমাগমে মান্য আদব-কায়দা, সাঁতার, গাড়ি-চালানো, ঘোড়ায়-চড়া, ছবি-আঁকা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে শিক্ষিত হবার জন্য উৎসাহ দিই, অথচ স্ত্রী-রোগ, রজঃচক্র, গর্ভধারণ, গর্ভপাত, জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা দেওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার দৈন্যকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিই। পরিবারের বয়স্করা যখন তরুণী মেয়েটিকে উপদেশ দেন, সংসারে সব ধরণের অসম্মানের মধ্যে আপস করে, নত হয়ে মানিয়ে চলা-টা মেয়েদেরই কাজ, যখন নামতা শেখানোর মতো যুবতী কন্যাটির মস্তিষ্কে গেঁথে দেওয়া হয় তোমার মেধা, তোমার আশৈশব-আকৈশোর শিক্ষা-চর্চা চুলোয় যাক, সংসারে তোমার ভূমিকা ধরিত্রীর মতো, ভুল-সম্পর্কে, নীরব-অপচয়ের মধ্যে টিকে থাকাটার নাম শাশ্বত-নারীত্ব, তখন কি মনে হয় না যে আমাদের সমাজ এখনও মেয়েদের আত্মনির্ভরতায় উৎসাহ দেয় না কেন? কেন উৎসাহ দেয় না তার জীবতাত্ত্বিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনে-ও?

নারীর মেধা, কর্মক্ষমতা, তার যৌনতা, মাতৃত্ব, সন্তানহীনতার উৎস, বিকল্প মাতৃত্ব, অথবা রোগ-সংক্রমণে নারীর-ভূমিকা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি পালন—এ ধরণের বহুবিধ বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় একটি গ্রন্থের দাবি বোধ করি বহুদিনের। যখন দেখি, পরিচিত কত মহিলা, প্রতিবেশী, ছাত্রী, আত্মীয়া বহু কুণ্ঠায় এবং গোপনে, নারীসুলভ দৈহিক সমস্যার কথা আলোচনা করে,তখনই মনে হয় নারী-জীবতত্ত্ব সম্পর্কে ধারণাটি সর্বার্থেই কতটা প্রয়োজনীয়। নিজেকে আমূল না চিনলে, অধিকারের জন্য লড়াই করা যায় না কি?

নারী দেহ বিষয়ে অজস্র কৌতূহলের কথা মনে রেখে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়। কন্যা-ভ্রূণ হত্যা (Female-Foeticide), মেয়েদের শরীরের গঠন (Female Body Structure), বয়ঃসন্ধি (Adolesence), মাতৃত্ব (Motherhood), সন্তানহীনতা (Infertility), গর্ভ ভাড়া দেওয়া মাতৃত্ব (Surrogate Motherhood), জন্ম-নিয়ন্ত্রণ (Birth-control), রজঃনিবৃত্তি (Menopause), রজঃনিবৃত্তির পরের জীবন (Life after menopause), নারীদেহবাহিত রোগ (Diseases transmitted by women), নারীর মানসিক ও দৈহিক ব্যাধি (Mental and Physical diseases of women), নারীর মেধা (Feminine-intellect), নারীর বিচিত্র যৌন-চেতনা (Unusual sexual conciousness of women), স্ব-যত্নে নারী (Self-care of women) —এই চোদ্দোটি বিষয় নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। লিখতে বসে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, ভীষণ শক্ত একটা কাজ করার দুঃসাহস আগেভাগে দেখাতে পারে একমাত্র মূর্খরা। হোক্ মুর্খামি, সাধারণ নারীর সেই সব নিভৃত জিজ্ঞাসা তথা চাহিদার কথা মনে রেখেই এই লেখালেখির চেষ্টা। অবশ্য এই চেষ্টার সব-টুকু ইচ্ছে পর্বে-ই রয়ে যেত, যদি না পুনশ্চ-এর শ্রী সন্দীপ নায়ক-এর সাগ্রহ উৎসাহ পেতাম। ভীষণ দামি এই কথাটা অনায়াসে বলতে পেরে বেশ ভালো লাগছে।

জানুয়ারি, ২০০৯

কৃষ্ণা রায়

সূচিপত্র

ছিন্ন-কুসুম কথা	....	১৫
মুকুলিত কিশলয়	....	২৯
শালবনে বৃষ্টি	....	৪১
সুধাসাগর তীরে	....	৫১
অকৃতার্থ যৌবনে	....	৭৫
অন্য-জননী	....	৮০
স্বাধিকারের বৃত্তে	....	৮৬
মায়াবী সাঁঝে	....	৯৫
অন্তরাগের দিনে	....	১০৫
ব্যাধির উৎসে নারী	....	১১২
আধি-ব্যাধির জগতে	....	১১৭
মেধা-মননের সাম্রাজ্যে	....	১৩৬
অন্তর্লোকের অলিন্দে	....	১৪৩
নিজের সঙ্গে কিছুক্ষণ	....	১৫৬

ছিন্নকুসুম কথা

আমি সেই মেয়েটি
যার জন্মের সময় কোনো শাঁখ বাজেনি।

—কবিতা সিংহ

চোখের আলোয় ঃ

বেশ মনে পড়ছে সেই দিনটার কথা। মাত্র একদিন হল 'মা' হয়েছি। একটি কন্যা সন্তানের মা। আমার শাশুড়ি নার্সিংহোমে দেখতে এলেন নবজাতিকাকে। সখেদে বললেন, 'গতকাল তোমার মা নাকি নার্সিংহোমের সব্বাইকে মিষ্টি খাইয়েছেন? কী দরকার ছিল অত খরচ করার? মেয়ে-ই তো হয়েছে, তাহলে আর খাওয়ানোর কী আছে? ছেলে হলে না হয় এসবের একটা মানে ছিল? সেদিনের অল্প বয়সি মা-টি সদর্পে প্রতিবাদ করেছিল, 'কেন? মেয়ে হলে মিষ্টি খাওয়ানো যাবে না কেন? তিনি নিতান্ত বিমর্ষ গলায় বলেছিলেন, 'না বৌমা, তোমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য কথাটা বলিনি। আসলে কি জানো, মেয়েদের জীবনটা বড়ো কষ্টের।' সারা জীবন লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বৈষম্য আর অবিচারের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মধ্যবিত্ত পরিবারের যে প্রৌঢ়া নারীটি মনোবল হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁর পক্ষে এমন ম্লান স্বীকারোক্তি অপ্রত্যাশিত নয়। ভুলতে পারি না, বি.এড ক্লাসের সহপাঠিনী সেই রূপহীনা, স্বাস্থ্যহীনা মেয়েটির কথা। একদিন ট্রেনে সহযাত্রী হওয়ার সুবাদে দীর্ঘক্ষণ গল্প করেছিলাম যার সঙ্গে এবং এক সময় সে বিষণ্ণ মুখে বলেছিল, আমার তো কোনোদিন বিয়ে হবে না। জানতে চেয়েছিলাম, কেন? উত্তরে সে বলেছিল—জানো না, আমরা যে বর্ধমানের আগুরি (উগ্রক্ষত্রিয়) সম্প্রদায়ের লোক। আমাদের ঘরে মেয়েদের বিয়েতে অনেক টাকা লাগে। আমার দুই দিদির বিয়ের পর বাবা সর্বস্বান্ত। স্কুলের চাকরিটাও যদি না পাই...। কতদিন আগেকার সেই ম্লানমুখী তরুণীটির হৃদয়-বেদনা আজও আমায় আমূল কাঁপিয়ে দেয়।

মনে পড়ছে সেই স্বল্প-শিক্ষিতা, পরিচিতা মহিলাটির কথা—পর পর তিন তিনটি কন্যা-সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে শাশুড়ির বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে যিনি আত্মঘাতী হয়েছিলেন। শাশুড়ির দোষ কী? জন্মাবধি তিনি শুনে এসেছেন—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। এ নিয়মের ব্যতয় হলে পুত্রবধূকে গঞ্জনা দেওয়ার অধিকার তাঁর আলবাৎ আছে। বেচারা শাশুড়িটি, কিংবা হতভাগ্য-আত্মঘাতী জননীটি নিজেও জানতেন না, **সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে মায়ের কোনো ভূমিকা-ই নেই।** প্রতিদিনের খবরের কাগজে, সংবাদ মাধ্যমে কত ঘটনাই তো দেখি, শুনি—কন্যা জন্ম দেওয়ার অপরাধে লাঞ্ছিত, পীড়িত মায়েদের কথা। প্রতিদিন-ই নতুন করে জানি, কন্যা জন্ম কী করুণভাবে অনাতিথেয়। কী শহর, কী গ্রাম—জন্মমুহূর্তে কন্যা-সন্তানকে হত্যা অথবা কন্যা-ভ্রূণ হত্যার ইতিবৃত্ত আমাদের

একটি সহজ সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়—সেটি হল পুত্র সন্তানের প্রতি অযৌক্তিক মোহ ঘৃণ-পোকার মতো নিঃশব্দে আমাদের সমাজ-সভ্যতাকে নিষ্ঠুরভাবে ক্ষয় করে চলেছে।

স্ত্রী-লিঙ্গ নির্মাণের উৎস

সবাই জানে সন্তানের জন্ম হয় নারী ও পুরুষের যৌন মিলনে, অথবা আরও বৈজ্ঞানিক ভাবে বলা ভালো ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনের ফলে। এই মিলনের ফলে যে ভ্রূণ সৃষ্টি হয় তার লিঙ্গ নির্ধারণ করে শুক্রাণু তথা পুরুষ। আমাদের দেহে বংশগতির ধারক ও বাহক হল কোশের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ক্রোমোসোম। পিতার শরীরের প্রতিটি শুক্রাণুতে আছে বাইশ জোড়া দেহ-ক্রোমোসোম ও এক জোড়া সেক্স বা যৌন ক্রোমোসোম। পুরুষের ক্ষেত্রে এই যৌন ক্রোমোসোম যুগলকে বলা হয় X ও Y ক্রোমোসোম। ঠিক একইরকমভাবে নারীর ক্ষেত্রে প্রতিটি ডিম্বাণুর মধ্যে আছে বাইশ জোড়া দেহ-ক্রোমোসোম ও এক জোড়া যৌন- ক্রোমোসোম, যারা নাকি এক্কেবারে এক ধরনের অর্থাৎ X ও X ক্রোমোসোম। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে বলা হয় জনন কোশ। দেহের অন্যান্য কোশের তুলনায় এরা একটু স্বতন্ত্র, কারণ এই কোশগুলি বিভাজিত হয়ে যখন সংখ্যা বৃদ্ধি করে নিজেদের, এদের অপত্য* কোশে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। তাই একে বলা হয় হ্রস্ব-বিভাজন। জীববিজ্ঞানের এই কিঞ্চিৎ জটিল বিষয়টি ছবির মাধ্যমে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

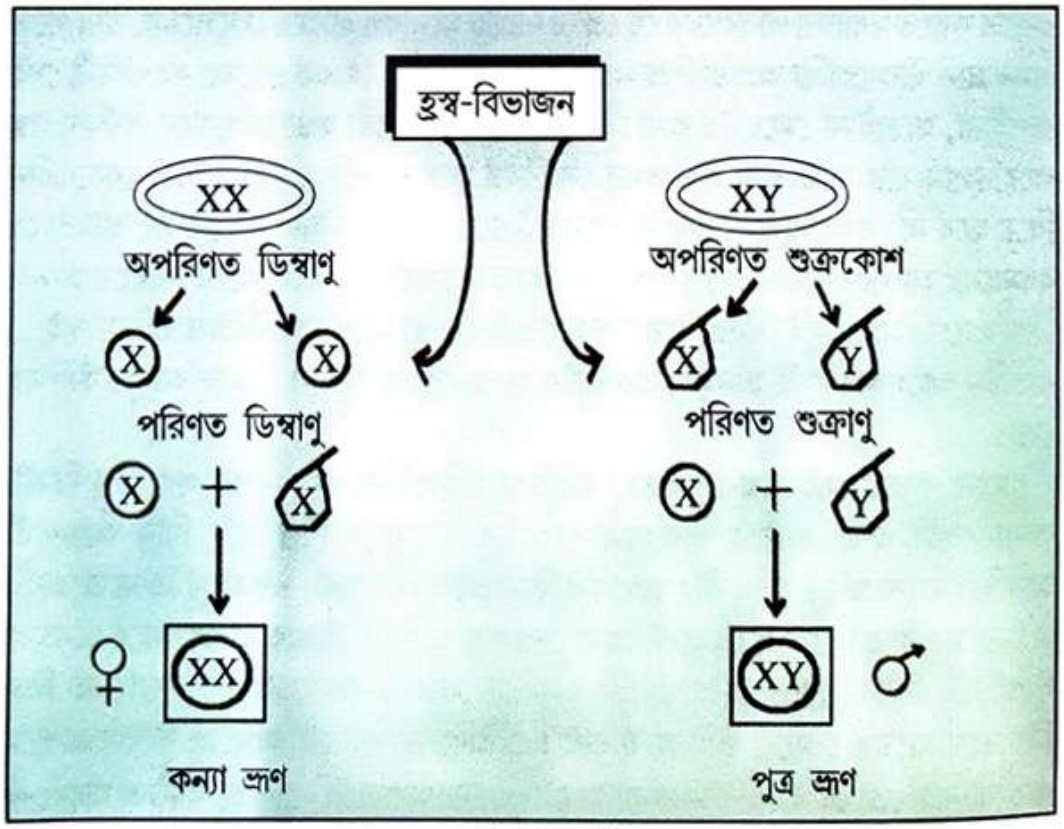

ভ্রূণের লিঙ্গ গঠন

**অপত্য কোশ : কোশ বিভাজনের ফলে সৃষ্ট নতুন কোশ।*

বিষয়টি সহজ করে বললে এরকম দাঁড়ায় যে পুরুষের দেহের আদি জনন-কোশ বিভাজনের পর যখন শুক্রাণু গঠিত হয়—তখন কিছু শুক্রাণু বহন করে ২২টি দেহ-ক্রোমোসোম ও একটি X-ক্রোমোসোম। অন্য দলের শুক্রাণুরা বহন করে বাইশটি দেহ-ক্রোমোসোম ও একটি Y-ক্রোমোসোম। তাহলে পুরো ব্যাপারটা কেমন হল? শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে সৃষ্টি হয় ভ্রূণের প্রথম কোশ জাইগোট, কিন্তু কেমন হবে তার পরিচয়? সাধারণভাবে, এ ক্ষেত্রে দু'ধরনের সম্ভাবনা থাকে।

সম্ভাবনা (১) ঃ শুক্রাণু (২২ + X) + ডিম্বাণু (২২ + X)

= ভ্রূণ (৪৪ + X + X)।

এক্ষেত্রে ভ্রূণ-টি হবে মেয়ে।

সম্ভাবনা (২) ঃ শুক্রাণু (২২ + Y) + ডিম্বাণু (২২ + X)

= ভ্রূণ (৪৪ + X + Y)।

এবারের ভ্রূণটি হবে ছেলে।

তাহলে, পুরো ঘটনাটা কী দাঁড়াল? **সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে—এ বিষয়ে কার ভূমিকা অমোঘ? নিঃসন্দেহে পুরুষের।** অথচ, কুসংস্কার, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসের কারণে, আজও পুত্রবতী না হওয়ার অপরাধে দেশে দেশে নারীকে শাস্তি পেতে হয়, হতে হয় ছিন্ন-বিবাহের স্বীকার, মরতে হয় জ্বলে-পুড়ে।

মেয়ে চাই না ডাক্তারবাবু, ছেলে হবে কি? ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ পর্ব

আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের কল্যাণে, সভ্য মানুষ সন্তানের লিঙ্গ জানার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতে নারাজ। 'অ্যামনিওসেন্টেসিস' ও 'আলট্রাসোগ্রাফির' দৌলতে খুব সহজেই গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব। এর মধ্যে, 'অ্যামনিওসেন্টেসিস' পদ্ধতিটি তুলনামূলক ভাবে জটিল। মায়ের জরায়ুতে ভ্রূণকে ঘিরে যে বিশেষ আবরণটি থাকে, তাকে বলে 'অ্যামনিওন'। এই আবরণটি একটি তরল পদার্থ বা 'অ্যামনিওটিক ফ্লুইড' ধারণ করে রাখে। গর্ভবতী নারীর উদরের মধ্য দিয়ে একটি ফাঁপা ছুঁচের সাহায্যে ৫ থেকে ১০ মিলিমিটার 'অ্যামনিওটিক-ফ্লুইড' বার করে নেওয়া হয়। সেই তরলে ভ্রূণের কোশও পাওয়া যায়। প্রাপ্ত কোশের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোম বিশ্লেষণ করে সহজেই ভ্রূণের লিঙ্গ যখন জানা যায়, তখন কোনো কোনো দম্পতির 'ইচ্ছে ঘোড়ার পায়ের চাপে' পিষ্ট হয় অস্ফুট কুসুমটি। 'মেয়ে? কি দরকার? ও ঝামেলা চুকিয়ে দিন ডাক্তারবাবু। আমাদের ছেলে চাই, ছেলে।' এ ভাবেই গর্ভস্থ কন্যা ভ্রূণকে হত্যা করার ঘটনাটিকে বলা হয় কন্যা ভ্রূণ হত্যা বা female-foeticide বা femicide। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গর্ভস্থ কন্যাভ্রূণটিকে হত্যা করা সম্ভব না হলেও জন্মের পর কন্যাশিশুটিকে হত্যা করা হয়। একে বলে female infanticide। অতীত কাল থেকেই ভারতে এ ঘটনা প্রচলিত, foeticide বরং একটি

আধুনিক ঘটনা। অতীতে গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ পরীক্ষা সম্ভব ছিল না, তাই আঁতুড় ঘরে বা আরও কিছুকাল পর কন্যা শিশুটিকে হত্যা করাই ছিল অবাঞ্ছিত কন্যা বর্জনের সহজ পদ্ধতি।

অ্যামনিওসেন্টেসিস : ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা

কবে থেকে শুরু হল গর্ভের সন্তানকে সঠিকভাবে চিনে নেওয়ার খেলা? ভারতে ১৯৭৪ সালে প্রথম, আলট্রাসোনোগ্রাফির (ইউ.এস.জি.) মাধ্যমে গর্ভস্থ শিশুর দৈহিক অস্বাভাবিকতা যাচাই করেন দিল্লীর অল্ ইন্ডিয়া মেডিক্যাল সায়েন্স (AIMS)-এর চিকিৎসকেরা। পদ্ধতির গুরুত্ব উপলব্ধি করার পর ১৯৭৯ সালে প্রথম লিঙ্গ-নির্ধারক ক্লিনিকের আবির্ভাব ঘটল। ক্রমে ব্যাঙের ছাতার মতো অজস্র ক্লিনিক ছড়িয়ে গেল দিল্লি, পাঞ্জাব, অমৃত্সর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে।

ছিন্নকুসুম কথার ইতিহাস

নবজাতক সন্তানটি 'পুত্র' হলে, সেটি ভীষণভাবে প্রার্থিত, আর কন্যা সন্তান? একেবারেই অনাতিথেয়—এ ভাবনার উৎস ভারতে বহু প্রাচীন। মনুর মতে, মানুষের জীবন-অন্তে পুত্র মুখাগ্নি করবে এবং তার ফলেই মৃত-পরিজনের মুক্তি ঘটবে। মুক্তি বা মোক্ষলাভ না হলে জন্মান্তরে যাওয়া সম্ভব নয়। আর কোনো নারী যদি শুধুই কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়, তাহলে বিয়ের এগারো বছর পর তাকে ত্যাগ করা উচিত। অতএব, জন্মমুহূর্তে শিশুকন্যাকে হত্যা করার ইতিহাস ভারতে নতুন নয়। প্রকাশ্যে বা গোপনে

এ প্রথা অব্যাহত ভাবে ঘটে চলেছে যুগ যুগ ধরে। অথচ, **বেদ বা রামায়ণ-মহাভারতের যুগে শিশুহত্যা প্রথার উল্লেখ নেই।** যজুর্বেদে অবশ্য নরমেধ যজ্ঞের কথা আছে, কিন্তু সেখানে শিশু বা শিশুকন্যাকে বলি দেওয়ার প্রথা ছিল না। প্রাচীন শাস্ত্র-পুরাণে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে শিশু হত্যা মহাপাপ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ তো পরিষ্কার বলেছে শিশু হত্যায় শত স্ত্রী বধের সমান পাপ হয়, আর নারী বধে মানুষ ব্রহ্মহত্যার অপরাধে পাপী বলে চিহ্নিত হয়। অথচ, শিশুহত্যা, বিশেষত কন্যাশিশু হত্যা ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। উদ্দেশ্য তার বহুমুখী। কখনো অন্ধ-ধর্মবিশ্বাস বা অকারণ জাত্যভিমান, কখনও বা পণ-প্রথার সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া, কখনও আবার শুধুই পিতৃপুরুষের রীতিকে অনুসরণ করার তাগিদে। ইতিহাস বলছে ভারতে শিশুকন্যা হত্যা প্রথার বিস্তার ছিল পূর্ব সীমান্তের নাগা ভূমি থেকে পশ্চিম সীমান্তের কচ্ছ পর্যন্ত, অন্যদিকে উত্তরের জম্মু-কাশ্মীর থেকে ভারতের সমগ্র মধ্যভাগ ও অন্ধ্র অঞ্চলেও। এই নিষ্ঠুর মারণ-যজ্ঞের ঋত্বিক ছিলেন অনেকক্ষেত্রেই তাদের জন্মদাত্রীরা। গভীর জঙ্গলে বা ঝরনার জলে, কিংবা দুধ-ভরা পাত্রে ডুবিয়ে রেখে তাদের মারা হত। কখনও পুঁতে দেওয়া হত ঘরের দাওয়াতে, অথবা মুখে পুরে দেওয়া হত ধুতুরা, আকন্দ বা মাদারের রস, কখনও বা শুধুই নুনের পুঁটলি।

এই সব বিবরণের কিছু কিছু পাওয়া যায় সতেরো শতকের প্রথম পাদে সম্রাট জাহাঙ্গিরের 'তুজুখ-ই-জাহাঙ্গিরি' নামক গ্রন্থে। জন্মমুহূর্তে কন্যা সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করার বিবরণ যেমন দিয়েছেন, তেমনি সেই অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ জারি করার কথাও লিখেছেন। পরবর্তীকালে, ভারতে আগত খ্রিস্টান মিশনারিরা এ সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বস্তুত ভারতে শিশুহত্যা বিশেষত কন্যাশিশু হত্যার প্রথা নতুন করে আবিষ্কার ও তার অবসান তথা উচ্ছেদের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসকেরা। ১৭৮৯ সালে জোনাথন-ডানকান নামে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী অযোধ্যার সীমান্তে জৌনপুর অঞ্চলে সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে বিনা-স্তন্যদানে ও অনাদরে হত্যা করার ইতিবৃত্ত লিখে গেছেন। লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল জেম্‌স টডের 'অ্যানাল্‌স অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস অফ্‌ রাজস্থান' গ্রন্থেও পশ্চিমভারতে শিশুকন্যা হত্যার বিশদ বিবরণ আছে। আঠারোশো শতকে, ভারতে ব্যাপকভাবে শিশুকন্যা হত্যা করা হত উত্তরপ্রদেশে, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, কচ্ছ, রাজস্থান, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে। আশ্চর্যের কথা এই, রাজা রামমোহনের মতো মানবপ্রেমী মহাপুরুষকে এ বিষয়ে কোনোভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। পূর্ব ভারতের মানুষের মধ্যে, পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণের জন্য প্রবল পুত্রকামনা বোধ থাকলেও জন্মমুহূর্তে বিশেষভাবে কন্যা সন্তানকে হত্যা করার কথা খুব বেশি পাওয়া যায় না।

উনিশ শতকের শেষভাগে, ব্রিটিশ অফিসারদের ডায়েরিতে শিশু-কন্যা হত্যার উল্লেখ আছে। এর আগে জোনাথন ডানকানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী